‘পয়োমুখম্’-এর আরশি ও বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মানুষ

দেবশ্রী ভট্টাচার্য

কল্লোল ও *কালি-কলম*-এর হাত ধরে বাংলা ছোটোগল্প যখন এগিয়ে চলেছে কোনো এক বেনামী বন্দরের দিকে— কবিতার পংক্তি যখন হয়ে উঠেছিল স্লোগান— “সম্মুখে থাকুন বসে ‘পথ রুধি’ রবীন্দ্র ঠাকুর/আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো/যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দুর।” (‘আবিষ্কার’ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত) কল্লোলের সেই কলরোল থেকে খুব বেশি দূরে ছিলেন না জগদীশ গুপ্ত। আমাদের আলোচ্য ‘পয়োমুখম্’ গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল *কালি-কলম* পত্রিকার পৌষ ১৩৩৪ সংখ্যায়। ‘দিবসের শেষে’, ‘পল্লীশ্মশান’, ‘ভরা সুখে’, ‘এইবার লোকে ঠিক বলে’, ‘অন্নদার অভিশাপে’, ‘পুরাতন ভৃত্য’, ‘প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী’, ‘তৃষিত আত্মা’ ও ‘পয়োমুখম্’ সহ মোট ন’টি গল্প নিয়ে ওই বছরেই প্রকাশিত হবে শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্তের প্রথম গল্পসংকলন *বিনোদিনী* (১৩৩৪)। *কল্লোল*-এর শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত *কালি-কলমে* এসে শুধু জগদীশ গুপ্ত হয়ে উঠলেন। প্রথম বর্ষ থেকেই (বৈশাখ ১৩৩৩) *কালি-কলম*-এর সঙ্গে জগদীশ গুপ্তের যোগাযোগ নিবিড়। বাংলা ছোটোগল্পে যে কারণে জগদীশ গুপ্ত বিশিষ্ট— ‘পয়োমুখম্’ গল্পটি গল্পকারের আখ্যান ব্যক্তিত্বের সেই স্বাতন্ত্র্যকে ধারণ করেছে। নদিয়া জেলার কুষ্টিয়া শহরে জন্মানো এই শক্তিশালী লেখক তাঁর সমকাল এবং উত্তরকালে তেমন জনপ্রিয় না হলেও, রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমার- শরৎচন্দ্র উত্তর বাংলা গল্পের জগতে বিশিষ্ট একটি স্থান করে নিয়েছিলেন। বয়সে খানিকটা বড়ো হওয়ার কারণেই হোক কিংবা চাকরি জীবনের অনিশ্চয়তার সূত্রেই হোক— কল্লোল গোষ্ঠীর অন্যান্য লেখকদের থেকে মন-মানসিকতায় জগদীশ গুপ্ত ছিলেন একেবারেই আলাদা। বাংলা ছোটোগল্পে তিনি কারও উত্তরসূরি নন, সচেতন ভাবে কোনো উত্তরসূরি তৈরিও করেননি। যদিও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কেউ কেউ উত্তরাধিকার ধারণ করেছিলেন। শহুরে মধ্যবিত্ত মানসিকতা বা আঞ্চলিক জীবনের দৈনন্দিনতা—এর কোনোটাই জগদীশ গুপ্তকে আকর্ষণ করেনি। বরং অনেক বেশি তিনি পৌঁছোতে চেয়েছেন মানবমনের তমসাবৃত গহনে। তাঁর আখ্যানভুবন সমাজ পরিচালিত, প্রচলিত মূল্যবোধের ধারণায় চালিত হয়নি। আমাদের আলোচনার সমর্থনে বিশিষ্ট গদ্যশিল্পী হাসান

আজিজুল হকের 'জগদীশ গুপ্ত : কথাসাহিত্যের বিপরীত স্রোত' প্রবন্ধটির একটি অংশ উল্লেখ করি :

> "সত্যি বলতে কি সমস্ত বাংলা সাহিত্যে জগদীশ গুপ্তের মতো আর কেউই এতো অবিচ্ছিন্নভাবে এতো রোখের সঙ্গে আগাগোড়া তিক্ত থাকেন নি। তিক্ত লেখক বলে যাঁর খ্যাতি সেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও নন। একটা হিসেবে সমাজ মানে তো শেষ পর্যন্ত মানুষ। অনেক মানুষ। আর সে অনেক মানুষের মধ্যেকার অসংখ্য সম্পর্ক। সম্পর্কগুলি নানাভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়। কখনো তা পরিবারের গণ্ডির মধ্যে কখনো তা পরিবারের বাইরে আরো অসংখ্য ধরনের লেনদেনের মধ্যে, থেকে যায়। আমরা দেখবো জগদীশ গুপ্ত এই সম্পর্কগুলিকে অর্থাৎ সমাজের ভিতরের মানব সম্পর্কগুলিকে অত্যন্ত নগ্নভাবে তাদের প্রকৃত স্বরূপে দেখাতে চেয়েছিলেন।"[১]

মানুষের নিহিত সত্তার জৈব, আদিম প্রবৃত্তি, শঠতা, আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গি, অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব, মানুষের অবচেতন, নারী-পুরুষের সম্পর্ক— এই বিচিত্রভাবের স্বরূপে জীবনকে দেখতে চেয়েছেন গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী জগদীশ গুপ্ত। তীব্র অর্থলিপ্সা মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম। সম্পত্তি, টাকার লোভ মানুষকে কতটা বিপথে চালিত করে, কতটা কু-কর্ম করায়— সেই অন্ধকার মনের ছবি অত্যন্ত নগ্ন, নির্মোহভাবে তুলে ধরেছেন জগদীশ গুপ্ত তাঁর 'পয়োমুখম্'-এ।

দুই

কল্লোল, *কালি-কলমের* যুগের অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত, অচেনা এই লেখক জগদীশ গুপ্তের রচনায় কল্লোল যুগের প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকলেও ছিল না কোনো বিদ্রোহের আস্ফালন বা সচেতন ঘোষণা। কোনো আতিশয্য কিংবা উচ্ছ্বাসের প্রকাশও চোখে পড়েনি তাঁর কোনো লেখায়। বরং অনেক বেশি নিবিড়, নির্মোহ, বিশ্লেষণী মনের প্রকাশ আমরা খুঁজে পাই যেখানে বাস্তবের পরিচিত, চেনা মানুষেরাও কখনও অচেনা হয়ে ওঠেন চরিত্রের বিশ্লেষণের গুণে। তাই বলাই যায় একথা যে, জগদীশ গুপ্তের প্রায় প্রতিটি আখ্যানই চরিত্রকেন্দ্রিক। এই কঠোর বাস্তব, রূঢ়-কঠিন নিষ্ঠুর বাস্তবের সাথে তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি আমাদের আশ্চর্য এক নেতিবাচকতার দিকে চালিত করলেও যেন কোনোভাবেই তাকে অস্বীকার করা যায় না। 'পয়োমুখম্'-এ জগদীশ গুপ্ত মানুষের জৈবসত্তা ও ন্যাচরালিজম্ এর কাঠামোর উপর কৃষ্ণকান্তকে দাঁড় করিয়েছেন। ঠিক সে কারণেই শেষপর্যন্ত কৃষ্ণকান্ত চরিত্রটির কোনো আত্মশুদ্ধি লেখক দেখাতে চাননি। সন ১২৯৮-এ *হিতবাদী* পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অন্যতম ছোটোগল্প 'দেনাপাওনা'-র কথা মনে পড়তে পারে আমাদের এই গল্পের নিষ্ঠুরতার প্রসঙ্গে। কিন্তু 'দেনাপাওনা'-র

নিষ্ঠুরতার প্রকাশ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। রায়বাহাদুর এবং কৃষ্ণকান্তরা একই গোত্রের মানুষ হলেও কৃষ্ণকান্তের মতো কোনো ছলের আশ্রয় নিতে হয়নি রায়বাহাদুরকে। জগদীশ গুপ্তের দক্ষ কলম 'পয়োমুখম্'-এ কৃষ্ণকান্তের বীভৎস, কুটিল, চমকপ্রদ স্বরূপ উন্মোচনে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছে। মুখ আর মুখোশের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে মূল্যবোধহীন সময় বিকৃত, কুটিল মনস্তত্ত্বকে টেনে বের করেছে আমাদের জন্য। প্রায় দুহাজার বছর আগের মহান কূটনীতিজ্ঞ পণ্ডিত চাণক্যের একটি শ্লোকের শব্দ বেছে নিয়েছেন লেখক তাঁর গল্পের নামের জন্য। যা গল্পের লক্ষ্যকে অনেক বেশি স্পষ্ট করেছে।

শ্লোকটি ছিল এইরকম :

> ''পরোক্ষে কার্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্
> বর্জয়েৎ তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্।।''
>
> "The friend who talks sweet in front and does harm in the back, such friend must be left just like a pot of poison with cream of milk on top."[২]

অর্থাৎ মেকি স্বভাবের মুখমিষ্টি মিত্রকেও পরিহার করতেই পরামর্শ দিয়েছিলেন চাণক্য। নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণী শক্তিতে একটি বিশ্লেষণী মন নিয়ে গল্পকার বুনেছেন একটি আশ্চর্য নিটোল গল্প— যার পরিশেষে পাঠকের জন্য অপেক্ষা করে থাকে আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত কিছু চমক। চাণক্য-শ্লোক থেকে 'পয়োমুখম্' শব্দটি উদ্ধৃতি চিহ্নসহ গল্পের শিরোনাম হিসেবে নির্বাচন যে কতটা লেখকের অভীষ্ট পূরণের সহযোগী হয়েছে, সেটা আমরা গল্প-অভিমুখী যাত্রায় ক্রমশই বুঝতে চেষ্টা করব।

গল্পের শুরুতেই আমরা জানতে পারি, কবিরাজ শ্রী কৃষ্ণকান্ত সেনশর্মা মহাশয়ের পুত্র ভূতনাথ তাঁর পিতার কাছেই আয়ুর্বেদশাস্ত্র পাঠ করে। মেধা, অধ্যাবসায়-এর কোনোটিই ভূতনাথের না থাকায় শিক্ষা সম্পূর্ণ না হতেই কবিরাজ শ্রী কৃষ্ণকান্ত সেনশর্মা পুত্রের বিয়ে দেন। সতেরো বছর কয়েকমাসের ভূতনাথের সঙ্গে বিয়ে হয় ন'বছরের মণিমালিকার, সর্বসাকুল্যে সাতশ টাকা পণমূল্যের বিনিময়ে। সাতশ টাকা পণের পেছনে যে কুট, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মিথ্যাচার লুকিয়ে আছে, তাও ব্যক্ত করতে ভুললেন না গল্পকার :

> "বিবাহের পূর্বে কৃষ্ণকান্ত কিঞ্চিৎ বিষয়বুদ্ধির আশ্রয় লইলেন... বৈবাহিক মহলে প্রচার করিয়া দিলেন, ভূতনাথ কলিকাতার বিখ্যাত প্রবীণ কবিরাজ শ্রী গোপালকৃষ্ণ দত্তগুপ্ত মহাশয়ের প্রিয়তম ছাত্র ব্যাকরণ ও সাহিত্য প্রভৃতি সমাপ্ত করিয়া মূল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে। ... আরো বলিলেন, দু-তিনটি পাশ করা ছেলের মূল্য এখন মাসিক বিশ-বাইশ টাকার অধিক নয়; আয়ুর্বেদের দিকে দেশের নাড়ির টান যথার্থ-ই ফিরিয়াছে; সুতরাং পশার দাঁড়াইয়া যাইতে বিলম্ব হইবে না; দু-তিন

বছরেই— ইত্যাদি। ...

তাই সাতশত টাকা পণ।"[৩]

১৩০১ বাংলা সনে জন্মানো ভূতনাথের যখন সতেরো বছর কয়েকমাস অর্থাৎ ১৩১৮ বাংলা সনে বিয়ে হয়— সেই সময় অনুযায়ী এই সাতশ টাকা পণ সে নেহাত কম নয়; একথা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না আমাদের। কিন্তু নিতান্তই বালিকা-বধূ মণিমালিকার সঙ্গে মিষ্টিমধুর বিবাহিত জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয় না ভূতনাথের। বিখ্যাত কবিরাজ শ্বশুর এবং কবিরাজ স্বামীর উপস্থিতিকে পরিহাস করে সামান্য জ্বরে ভুগে হঠাৎ ভেদবমি হয়ে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করা মণিমালিকাকে আটকাতে পারে না। বালখিল্য আচরণ, মিষ্টি-প্রেম, স্বভাব-সারল্য দিয়ে মণি সকলেরই যে নয়নের মণি হয়ে উঠেছিল একথা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। মণির স্মৃতি অমলিন। কিন্তু তবুও 'কৃষ্ণকান্তের ভগবদেচ্ছায়' মণির স্মৃতি একেবারেই বিলীন হয়ে যায়! মণির শোকে যে 'কলাপ' ভূতনাথের কাছে 'প্রলাপ'-এর মতো অসহ্য হয়ে উঠেছিল, সেই কলাপে ভূতনাথ পুনরায় মন দিতেই কৃষ্ণকান্ত পুত্রের পুনরায় বিয়ে দিয়ে দেন। পরপর দুটো লাইনে ব্যবহৃত এই 'পুনরায়' শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। কৃষ্ণকান্তের স্বৈরতান্ত্রিক প্রবল নিষ্ঠুর আধিপত্যবাদ সংসারের প্রতিটি মানুষের শোক, অনুভূতির স্থায়ীত্ব এবং ভারসাম্যের উপরে কতটা ক্রিয়াশীল তারও খানিকটা প্রমাণ মেলে এই তীব্র ব্যঙ্গোক্তিতে। এক্ষেত্রে পুত্রের মন অপেক্ষা স্বয়ং শিবের দুবার বিয়ে করার উদাহরণ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হয় কৃষ্ণকান্তের। পুত্রের দ্বিতীয় বিয়েতে দেরি না করে পুত্রবধূ অনুপমাকে পাঁচশ পঞ্চাশ টাকা পণমূল্যের বিনিময়ে ঘরে আনেন কৃষ্ণকান্ত। প্রথমবারের তুলনায় পণমূল্য এবারে কমে যায় কৃষ্ণকান্তের। কারণ প্রথম স্ত্রী মণিমালিকার মৃত্যু ভূতনাথকে খানিকটা ম্লান করেছে। অগত্যা এই সহাবস্থান! কিন্তু একটু লোকসান হলেও বৌটি এবারে পাওয়া যায় আরও ভালো। সুন্দরী। 'চমৎকার একটা সুহসিত প্রসন্ন লক্ষ্মীশ্রী অনুপমার মুখপদ্মে বিরাজ করিতেছে— যেন বালার্ক সিন্দুর শোভিত ঊষা...' যা দেখে মাতাঙ্গিনীর চোখ সরে না, ভূতনাথও মুগ্ধ-আবিষ্ট হয়। জীবনের পাঠ আর বাস্তব পাঠের সুন্দর মেলবন্ধন ঘটান লেখক এসময়ই, ভূতনাথের কলাপ শেষে মুগ্ধবোধের চর্চার শুরু দিয়ে। তবে শুধু রূপ নয়; একই সঙ্গে সাহস, বুদ্ধি, স্পষ্টবাগ্মিতা এবং ব্যক্তিত্ব সচেতন এক নারী হিসেবেই গল্পে অনুপমার উপস্থিতি। বস্তুত অনুপমার এই ব্যক্তিত্বের কাছেই বারবার প্রতিহত হয়ে ফিরেছে সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি ভূতনাথের বাসনা জাগ্রত ক্রম পরিণত মন। এদিকে পুত্রবধূর ভাগ্যে পাটের ব্যবসায় দু-হাজার টাকা লাভ বৈষয়িক কৃষ্ণকান্তকে, আত্মসুখী কৃষ্ণকান্তকে মেকি প্রীতিবোধ এনে দেয় পুত্রবধূর প্রতি। কিন্তু বিধি বাম! 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়!' আর তাই অবস্থার পরিবর্তনে সেই মুনাফার সমস্ত টাকাই যখন বেরিয়ে যায় পাটের টানে তখন কৃষ্ণকান্তের প্রীতি, অপ্রীতিতে রূপান্তরিত হতে সময় লাগেনা!

আশ্চর্যজনকভাবে, এরপর অনুপমার জ্বর, জ্বর ছাড়া এবং অন্নপথ্যের পরেই ভেদ আরম্ভ হয়ে ধাত বসে গিয়ে সকলকে অবাক করে মণিমালিকার পথ ধরতে অনুপমারও দেরি হয় না! চপল, যৌবনের রাস আয়োজনে পূর্ণ, দাম্পত্যে অপর্যাপ্ত নিবিড় করে পাওয়া অনুপমার এই মৃত্যু ভূতনাথের জীবনে একটা নতুনতর আঘাত দিয়ে যায়, মণিমালিকার মৃত্যুতে যা সে বোধ করেনি। বলা ভালো, অনুপমার মৃত্যু ভূতনাথের একধরনের আত্মবীক্ষার সূচনা ঘটায়। অনুপমার মৃত্যুশোকে পরিপূর্ণ সচেতন বোধ সম্পন্ন এক মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার পথ সূচিত হয়। আত্মবোধের উন্মেষপর্বে এই কলাপ, মুগ্ধবোধ শেষে পরিপূর্ণ কবিরাজ সত্তাটিও যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু পরিণত মন, বিয়ের ক্ষেত্রে নিস্পৃহতা সত্ত্বেও অর্থগৃধ্নু পিতার বেয়াড়া লোভ এবং অমানবিক যুক্তিকে পর্যদুস্ত করতে পারে না ভূতনাথ। পিতার ধিক্কার, ভৎর্সনা, অভিযোগ, অনুযোগ, দোহাই, অনুজ্ঞার অবিশ্রান্ত তাড়নায় মরিয়া হয়েই নতি স্বীকার করে তৃতীয় বিয়েতে পুনর্বার সম্মত হতে হয় ভূতনাথকে। তৃতীয় বিয়ের এই সম্মতি ভূতনাথের বিষাদ এবং স্বাভাবিকভাবেই পিতা কৃষ্ণকান্তের উল্লাসের বিষয় হয়। কারণ তার 'পণ ও পাত্রী ঠিক ছিলো। দু-দশদিন অগ্রপশ্চাৎ-কৃষ্ণকান্ত দুটিকেই ঘরে তুলিলেন।' এ প্রসঙ্গে গল্পকারের বর্ণনাও ইঙ্গিতবাহী। বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না এই অগ্রিম পণ নেওয়ার সূত্রেই পুত্রের প্রতি বিয়ে সংক্রান্ত বিষয়ে পিতা কৃষ্ণকান্তের বিষম, অমানবিক দার্শনিক শাস্ত্রজ্ঞান দান। কারণ পণমূল্যের অঙ্গটি নেহাত মন্দ নয়! পণ ছিল 'আটশ টাকা'। গল্প থেকেই আমরা জানতে পারি পাত্রীর গায়ের ময়লা রঙ এই পণমূল্য নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল! সে যাইহোক! সুন্দর ভ্রূ-যুগল, আবেশ ভরা চোখের মায়ায়, কথায়-বার্তায়, আদরে-আলাপে তীক্ষ্ণধী সম্পন্না ভূতনাথের তৃতীয় স্ত্রী বীণাপাণি তার গায়ের ময়লা রঙের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। পূর্ববর্তী বধূদের মত মাতঙ্গিনীর মাতৃহৃদয় বীণাপাণিকেও আপন করে নিয়েছিল! জীবনের অভিজ্ঞতায় বয়সের প্রাজ্ঞতায় অলক্ষ্যে থেকেও তাই তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন:

> "পুত্রের মন বসিতেছে। ... এ বসায় কলরব নাই, উদ্দামতা নাই, বিক্ষোভ নাই। কায়-পরাকায়ের শঙ্কার নিশ্বাসে তাহা উতপ্ত নহে— এ বসা শুধু একটা রসঘন নির্মল মধুরতার মাঝে নিষ্পম্পশান্ত আত্মসমর্পণ।"[৪]

এই শান্তি, এই আনন্দ মাতঙ্গিনীর মাতৃহৃদয় পূর্ণ করেছিল। ভূতনাথের তৃতীয়া পত্নী বীণাপাণি তার শ্বশুরের অনুগ্রহও লাভ করেছিল নিতান্তই বৈষয়িক সমৃদ্ধির লালসায়। ময়লা গায়ের রঙের অপরাধে শ্বশুরকে দেওয়া তার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বাবার গোপনে পাঠানো দশটি টাকার মাসাহারায় মেকি অনুগ্রহের পাত্রী হয়েছিল সে। ধীরে ধীরে পট পরিবর্তনের পথকে সামনে আনতে চান গল্পকার। পূর্ণাঙ্গ কবিরাজ ভূতনাথের পসার বৃদ্ধির কথা এর আগেই জানিয়েছেন তিনি। অর্থনৈতিক সাফল্য এবং স্বাধীনতা

ভূতনাথের সঙ্কুচিত ব্যক্তিত্বকে যেভাবে প্রসারিত করে তা দিয়ে তার পিতার নামে অসহায় শ্বশুরের পাঠানো মাসোহারার দশটি টাকার রহস্যভেদ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। স্বাভাবিকভাবেই পিতার এই কদর্যলোভী স্বরূপ অনুভব করেই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ভূতনাথের সত্তা। পিতৃভক্তি দূরে গিয়ে সন্দেহ, অবিশ্বাস, শ্রদ্ধাহীনতাই জায়গা নেয় পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মাঝে। ইতিমধ্যে বীণাপাণির জ্বরকে কেন্দ্র করে ইতিহাস পুনরাবৃত্ত পথে এগোতে চায়। কিন্তু পিতার প্রতি পুত্রের সাবধানী দৃষ্টি 'প্রাণরক্ষার দূত' মাতঙ্গিনীর 'মধুসূদন' হয়ে বীণাপাণির জীবন বাঁচায়। কাপড়ের খুঁটের আড়ালে রাখা পিতৃদত্ত খল মেশানো ওষুধের শিশিসহ ভূতনাথের প্রবেশ কৃষ্ণকান্তর প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করে। সেই বর্ণনাটি লেখকের শব্দচয়নে ভীষণ রকম বাস্তব ও জীবন্ত হয় আমাদের কাছে এভাবেই :

> "কৃষ্ণকান্ত কবিরাজ তাকিয়ায় ভর দিয়া অর্ধশায়িত অবস্থায় পরম তৃপ্তির সহিত চোখ বুজিয়া শটকা টানিতেছিলেন।
>
> কিন্তু এ সুখ তাঁর অদৃষ্টে টিকিল না।
>
> ... মানুষের পায়ের শব্দে চোখ খুলিয়াই তিনি সামনে যেন ভূত দেখিলেন—এমনি অপরিসীম এসে তার সর্বশরীর থরথর করিয়া কাঁপিয়া মুখ দিয়া কেবল একটি অর্ধোচ্চারিত স্বল্পজীবি আর্তনাদ বাহির হইয়া কণ্ঠ নিঃশব্দ হইয়া রহিলো।
>
> ভূতনাথ সেদিকে দৃকপাতও করিলো না। একটু হাসিয়া বলিলো, 'এ বৌটার পরমায়ু আছে, তাই কলেরায় মরলো না বাবা। পারেন তো নিজেই খেয়ে ফেলুন।' বলিয়া তাই ওষুধ সমেত হাতের খল আড়ষ্ট কৃষ্ণকান্তের সম্মুখে নামাইয়া দিলো।"[৫]

এই অংশটিতে এসে গল্পটি উড়াল নেয়। আমূল চমকে দেয় পাঠককে। গল্পের একদম শুরুতে নির্বোধ, মূর্খ পুত্র উপহাসের লক্ষ্য হয়েছিল পরম প্রতাপান্বিত কবিরাজ পিতার। গল্পের শেষের এই আকস্মিক নাটকীয় পরিসমাপ্তি যেন নিয়তির এক চরম লিখন! বুমেরাং এর মতন! গল্পের শেষে সেই নির্বোধ, মূর্খ পুত্রই নির্মমভাবে পিতার বিকৃত, বিষাক্ত, গোপন, নিষ্ঠুর, পৈশাচিক অর্থ লালসার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করেছে। বিদ্রূপ করেছে তাকে। প্রকৃত কবিরাজ নয়, ক্রীড়ানক হিসেবে পুত্রকে ব্যবহার করার অভিসন্ধি গোপন থাকেনি শেষপর্যন্ত কৃষ্ণকান্তের। কিন্তু আপাত পিতৃস্নেহের আবরণের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা ভয়ংকর অসাধু, নিকৃষ্ট এই 'বিষকুম্ভং' অর্থলোলুপ সত্তার আদিরূপটি প্রকাশিত হতে পেরেছে পুত্রেরই সাহায্যে।

তিন

বিকৃত আদিমসত্তা মানুষের জীবনকে কীভাবে বিপর্যস্ত করে, 'পয়োমুখম্'-এ জগদীশ গুপ্ত অনুসন্ধান করেছেন সেই রূপ। বারবার অর্থলাভের আশায় পুত্রের বিয়ে দিয়ে

যৌতুক লাভ এবং তারপর কৌশলে বিষ মেশানো ওষুধ খাইয়ে পুত্রবধূদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার এই নৃশংস পদ্ধতিটি ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের আলোয় আমরা পড়তে পারি। জগদীশ গুপ্ত এবং কল্লোল যুগের আরও অনেকের লেখতেই সেই সময় ফ্রয়েডীয় সাইকো-অ্যানালিসিসে বিষয়টি গুরুত্ব পায়। কিন্তু জগদীশ গুপ্তের কোনো লেখার মধ্যেই আমরা যেমন অযথা বা অহেতুক কোনো চাপিয়ে দেওয়া তত্ত্বের বাড়াবাড়ি দেখিনা, অন্যতম বিখ্যাত গল্প 'পয়োমুখম্' ও তার ব্যতিক্রম নয়। আমরা সকলেই জানি ফ্রয়েড মূলত মানবমনের দুটি মুখ্য প্রবৃত্তির কথা বলেছেন। একটি এরস বা প্রেমবৃত্তি বা কামবৃত্তি এবং অপরটি থ্যানাটস বা মৃত্যুপ্রবৃত্তি বা ধ্বংসবৃত্তি। এরসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় সকল কর্মশক্তি বা পজিটিভ এষণা, ঠিক তেমনিভাবেই মৃত্যুবৃত্তি বা ধ্বংস, বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী সমস্ত নেগেটিভ বৃত্তিগুলি থ্যানাটসের প্রভাবেই আমাদের মনের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়। 'পয়োমুখম্'-এ জগদীশ গুপ্ত কৃষ্ণকান্তের মধ্যে এই ধ্বংসাত্মক বৃত্তির অধিক ক্রিয়াশীলতাকে মনোবিশ্লেষণের আলোয় বিশ্লেষণ করেছেন। যেখানে একটির পর একটি পুত্রবধূকে বিনা কারণে, ব্যক্তিসুখ চরিতার্থ করতে নির্বিচারে, নির্দ্বিধায় হত্যা করার এই মানসিকতা কৃষ্ণকান্তের মধ্যে সবসময় প্রকাশ পেয়েছে। মানুষের আদিম অবস্থায় থাকা ইদ-সর্বস্ব প্রবণতা যা শুধু সুখ বা Pleasure Principle দ্বারাই পরিচালিত হয়। সেই আদিম জৈব সত্তার এক আদর্শ রূপ হিসেবে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-পাপবোধ বিবর্জিত এক মানুষ হিসেবেই কৃষ্ণকান্ত সেনশর্মা বিশ্লেষিত হয়েছেন আমাদের কাছে। তাই শেষ পর্যন্ত চরিত্রটির কোনো আত্মশুদ্ধি ঘটে না। কবিরাজী শিক্ষক থেকে হন্তারক, এবং পিতা থেকে অর্থপিশাচে কৃষ্ণকান্তের এই রূপান্তরকে সর্বজ্ঞ কথনরীতিতে, নির্মোহ, নিরাসক্ত দৃষ্টিতেই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন জগদীশ গুপ্ত। কোথাও ঘোষণা করে নয়, বরং নিতান্তই সহজ, সাধারণ তথা তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গধর্মী বাক্য প্রয়োগে পাঠকের সঙ্গে যোগ রেখেছেন। কৃষ্ণকান্তের জীবনের এই রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় পুত্র ভূতনাথের জীবনের পরিবর্তনটুকুও লক্ষ্যণীয়। আত্মনির্ভরতার পথ ধরে আত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মাত্র একবারই ভূতনাথ পিতার বিপক্ষে দাঁড়ানোর শক্তি পেয়েছে। নয়তো গোটা সময়ে হন্তারক পিতার আধিপত্যকামী মৃত্যুপ্রবৃত্তি আরও সকলের মত ভূতনাথও গ্রস্ত ছিল ভীষণভাবেই। একটু একটু করে পিতার বিপক্ষে একবার ভূতনাথের দাঁড়ানোর এই চরম মুহূর্তটিকে জগদীশ গুপ্ত সূক্ষ্ম কিছু ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে খুব সুন্দরভবে উপস্থাপন করেছেন।

মেধা, পরিশ্রম বা আগ্রহ কোনোটাই সেভাবে না থাকলেও ভূতনাথ তার পিতার কাছেই কবিরাজী শিক্ষার পাঠ আরম্ভ করে। পুত্রের অপরাগতা বা বুদ্ধিহীনতায় পিতার হাসি-তামাশা। মজা-ব্যঙ্গের মধ্যে দিয়েই পিতা-পুত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের বৈষম্য, অমানবিকতা, অপ্রেম এবং নিষ্ঠুরতার দিকটিতে প্রথম আলো ফেলেন গল্পকার। শিক্ষার

পাঠ অসম্পূর্ণ থাকতেই নিতান্তই সতেরো বছরের পুত্রের বিয়ে দেওয়া, বারেবারেই পুত্রের মন, সিদ্ধান্ত, আবেগকে পাত্তা না দিয়ে অর্থলালসা চরিতার্থ করতে পুত্রবধূদের হত্যা করে সরিয়ে দেওয়ার বিকৃত, জটিল প্রবৃত্তির খেলায় কৃষ্ণকান্তের মেতে ওঠাটি যখনই ধরা পড়েছে পুত্র ভূতনাথের কাছে— সেখান থেকেই তৈরি হয়েছে আরও একটি পাঠ সম্ভাবনা। আধিপত্যের রাজনীতি দিয়েও গল্পটিকে আমরা পড়তে পারি। কৃষ্ণকান্ত ও ভূতনাথের এই মানসিক দূরত্ব এবং অপরিসীম দ্বন্দ্বের পটভূমিতে গল্পকারের ব্যক্তিজীবনের প্রভাব পড়াটাও বিশেষ আশ্চর্যের নয়। পারিবারিক ঐতিহ্যকে খানিকটা অস্বীকার করে নিজস্ব স্বাধীন মত এবং জীবন পথ বেছে নেওয়ার প্রতিফলন খুব একটা সুখকর বা স্বস্তিদায়ক ছিল না জগদীশ গুপ্তের ব্যক্তিজীবনে। সেই অভিমান, দূরত্ব, অনাস্থা, অনিশ্চয়তার খানিকটা প্রভাব হয়তো কৃষ্ণকান্ত এবং ভূতনাথের সম্পর্কের মধ্যে এসে পড়েছে অনিচ্ছাকৃতভাবেই।

কলাপ পড়তে পড়তেই সতেরো বছরের ভূতনাথের সঙ্গে বিয়ে হয় ন'বছরের ছোট্ট কিশোরী মণিমালিকার। একরত্তি, ছোট্ট খেলার সামগ্রী; স্নেহের পুত্তলি মণিমালিকার সঙ্গে ভূতনাথের বিবাহ পরবর্তী প্রেম সম্পর্কটি দাম্পত্যে পৌঁছোনোর পূর্বেই সাঙ্গ হয়েছে মণির ইহলীলা। মণির শোকত্তীর্ণ কলাপের প্রলাপ সহ্য করে 'মুগ্ধবোধ'-এর পর্বে ভূতনাথের জীবনে এসেছে যৌবনের রাস আয়োজনে পূর্ণ সুন্দরী স্ত্রী অনুপমা। জীবনের পূর্ণপ্রভায়, মুগ্ধবোধে, দাম্পত্যের নিবিড় অপর্যাপ্ততায় অনুপমার চলে যাওয়া দিয়ে জীবনকে আরও একবার নতুন করে বুঝেছে ভূতনাথ। কিন্তু কলাপ, মুগ্ধবোধ পরবর্তী ভূতনাথ একজন সম্পূর্ণ কবিরাজ। জীবনের এই পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পর্বেই তার জীবনে এসেছে বীণাপাণি। নামটি সঙ্কেতবাহী। পিতা-পুত্রের সম্পর্কের নিঃশব্দ সঙ্কটটি উন্মোচনে এই নামযুক্ত একজন নারীর পরোক্ষ ভূমিকাকে খুব সঙ্গতিপূর্ণভাবেই ব্যবহার করেছেন গল্পকার। বীণাপাণি অর্থাৎ সরস্বতী। যিনি জ্ঞানের দেবী, সুন্দরের দেবী— সর্বার্থে সম্পূর্ণতার দেবী। বস্তুত বলা যায়, বীণাপাণির সঙ্গই ভূতনাথকে সমস্ত অজ্ঞতা, অসুন্দর, অন্ধকার থেকে আলোর পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। জীবনের পঙ্কিলতা, কুটলিতা, নিষ্ঠুরতার তমসাবৃত জগতকে চিনতে, বুঝতে শিখিয়েছে। পিতা কৃষ্ণকান্ত এবং পুত্র ভূতনাথের সম্পর্কের বিশ্লেষণে, কৃষ্ণকান্তের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচনে অনুমান করাই যায় বীণাপাণিকে অনুঘটকের মতই ব্যবহার করতে চেয়েছেন গল্পকার।

চার

'পয়োমুখম্' শুধুমাত্র পণপ্রথার বিরুদ্ধেই একটি প্রতিবাদের গল্প নয়। সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের আলোকে মূল্যবোধহীন অসুস্থ সময়, বিকৃত কুটিল মনস্তত্ত্বের গল্পও বটে। মূল্যবোধহীন সময়ের নাগপাশে বন্দী মানুষের মুক্তি আজও ঘটেনি। গ্লানি প্রবহমান। তাই আজও অতি

মোলায়েম ছদ্মবেশে আমাদের শিক্ষিত, আধুনিকতার সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বেরিয়ে পড়ে সভ্যতার নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর নানা ঘটনা। জনপ্রিয়তার শীর্ষে গিয়ে বিজ্ঞাপিত হয়, বিক্রি হয় সাতদিন কিংবা পাঁচদিনে উজ্জ্বল, ফর্সা হওয়ার নানা প্রসাধনী। ১৯২৭ থেকে ২০১৭ তে এই নব্বই বছরে সময়ের অগ্রগতিতে এমন অনেক বিকৃত, রোগগ্রস্থ 'পয়োমুখম্' কৃষ্ণকান্তদের সঙ্গে আমাদের নিশ্চয়ই পরিচয় হয়েছে। আগামী দিনে তাদের সংখ্যাটাও আর থাকবে না গণনার সংখ্যাধীন। সেইসব অগণিত কৃষ্ণকান্ত— অসুস্থ সময়, বিকৃত লালসার ফাঁদে বন্দী মানুষদের নিষ্ঠুরতাকে চিহ্নিত করেছেন জগদীশ গুপ্ত তাঁর 'পয়োমুখম্'-এ।

তথ্যসূত্র

১. *জগদীশ গুপ্ত : কথা সাহিত্যে বিপরীত স্রোত*, হাসান আজিজুল হক, *জগদীশ গুপ্তর গল্প* (সম্পা. সুবীর রায়চৌধুরী) দে'জ, পরিশিষ্ট অংশ, পৃ. ২৩৫।

২. Sanskrit : Samskrutam.com/en.
Literature-Shioka-Chaanakya-neeti.ashx.

৩. 'পয়োমুখম্' *'জগদীশ গুপ্তর গল্প'*, সম্পা. সুবীর রায়চৌধুরী, দে'জ, কলকাতা, পৃ. ৬৫

৪. ঐ, পৃ. ৭৪

৫. ঐ, পৃ. ৭৭